স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সি

ডাঃ মোঃ বদরুল ইসলাম[১], আইসিডিডিআর,বি

ডাঃ তাহমিনা ইসলাম, উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

রুপার সাথে আমার[১] দেখা হয় বছর ছয়েক আগে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েটির বয়স তখন ৩৫-৩৬ হবে। রুপার দুই ছেলে। বড় ছেলে নাইমের বয়স তখন সাত। নাইমের মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সি আছে। অনেক ডাক্তারকে দেখিয়েও ওর মৃগীরোগ নিয়ন্ত্রণে আসছে না। তিন ধরনের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। ওষুধের সাহায্যে মৃগীরোগ কিছুটা কমলেও সারাদিনই তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে, পড়াশুনায় মন দিতে পারে না। প্রায়ই স্কুল কামাই হয়। রুপা তার এই ছেলেটিকে আমার কাছে দেখাতে চায়। আমি কাজ করি গুলেইন বারী সিন্ড্রোম বা এক ধরনের প্যারালাইসিস-জাতীয় অসুখ নিয়ে। আমি রুপাকে বুঝিয়ে বললাম মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সি আমার বিষয় নয়। নিউরোসায়েন্স ইনস্টিটিউট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা পিজি হাসপাতালে নিউরোলজি বিভাগে গিয়ে এই চিকিৎসা করাতে হবে।

রুপার দৃঢ় বিশ্বাস আমি ওর ছেলের চিকিৎসা করতে পারবো। এই অন্ধ বিশ্বাসের কারণ আমি বুঝতে পারি রুপার আমার ঠিকানা যোগাড় করার ঘটনা থেকে। আমাদের প্রজেক্টের একজন গুলেইন বারী সিন্ড্রোমে আক্রান্ত রোগীর কাছ থেকে সে আমার ঠিকানা পেয়েছে। এই রোগীটি প্রথমে মারাত্মক ধরনের প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হলেও এখন সে প্রায় সুস্থ। রুপার বিশ্বাস, যে ডাক্তার প্যারালাইসিস ভালো করতে পারে সে মৃগীরোগও সারাতে পারবে।

আমি ওকে বোঝাই যে, ছেলেটির প্যারালাইসিস নিজে থেকেই সেরেছে, এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। আমি ওকে সময়ে সময়ে উপদেশ দিয়েছি মাত্র। রুপা চুপ হয়ে যায়। ভেজা চোখে করুণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাকরুদ্ধ স্বরে বলে আমার ছেলেটি কি কোনোদিন ভালো হবে না স্যার? ওর চোখে আমি সন্তান হারানোর ভয় দেখতে পাই। ভয়টা আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। আমি নাইমকে নিয়ে আসতে বলি। নাইম স্বভাবে বেশ লাজুক। এই বয়সের শিশুদের চোখে-মুখে যে চাঞ্চল্য থাকে তা ওর মধ্যে অনুপস্থিত। মনে হলো ও একটা ঘোরের মধ্যে আছে। ওর জন্মের সময় রুপার প্রায় জীবননাশের উপক্রম হয়েছিলো বলা যায়। প্রসব ব্যথা ওঠার প্রায় আঠারো ঘণ্টা পর নাইম ভূমিষ্ঠ হয়। মেহেরপুরে ওদের গ্রামে ছিলো না কোনো হাসপাতাল। বাড়িতে চৌদ্দ ঘণ্টা পার হওয়ার পরেও যখন ও ভূমিষ্ঠ হচ্ছিলো না তখন রুপাকে সদরে নেওয়া হয়েছিলো। অবশেষে সিজারিয়ান করে যখন ছোট্ট নাইম পৃথিবীতে এলো তখন তার সারা শরীর নীল হয়ে ছিলো। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করার বেশ কিছুক্ষণ পর ও কেঁদে ওঠে। তার পরের বছর দুয়েক ছিলো রুপার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়। মা হওয়ার যে স্বর্গীয় তৃপ্তি তা রুপা কেবল দু'বছরই পেয়েছিলো। এরপর এক বর্ষার রাতে নাইমের প্রচণ্ড জ্বর আসে। জ্বরের এক পর্যায়ে ও অজ্ঞান হয়ে যায় এবং খিঁচুনি শুরু হয়। ডাক্তাররা বলেছিলেন এটি জ্বর থেকে হয়েছে। বয়স বাড়লে আস্তে আস্তে কমে যাবে। সেই ভবিষ্যতবাণী সত্যি হয় নি। যখন জ্বর ছাড়াই খিঁচুনি শুরু হলো তখন ডাক্তাররা বললেন ওর মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সি হয়েছে। জন্মের সময় শ্বাস নিতে না পারা বা বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া থেকে এটি হয়েছে।

প্রথম প্রথম একটি ওষুধেই নাইমের মৃগীরোগ নিয়ন্ত্রণে থাকত। বছর তিনেকের ভেতর তিনটি ওধুধেও তা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছিলো না। রুপার কষ্টের সংসার, স্বামী সরকারি ব্যাংকে ছোট চাকরি করে। ছেলেটিকে নিয়ে ঢাকার সব বড় বড় হাসপাতালে গিয়েছে। ডাক্তাররা বলেন ওকে সব ধরনের ওষুধই দেওয়া হয়েছে। এখন আমাদের আর তেমন কিছু করার নেই। নাইম আসলে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট এপিলেপ্সিতে ভুগছে যেক্ষেত্রে দুই বা তার বেশি ধরনের ওষুধেও কাজ হয় না। নিউরোলজির বইপত্র ঘেটে দেখলাম কিছু নতুন ওধুধ নাইমকে দেওয়া যেতে পারে। আগের ওষুধ কমিয়ে

মৃগীরোগের প্রধান উপসর্গ খিঁচুনি: সূত্র-ওবেইটএপিলেপ্সি.ইনফো

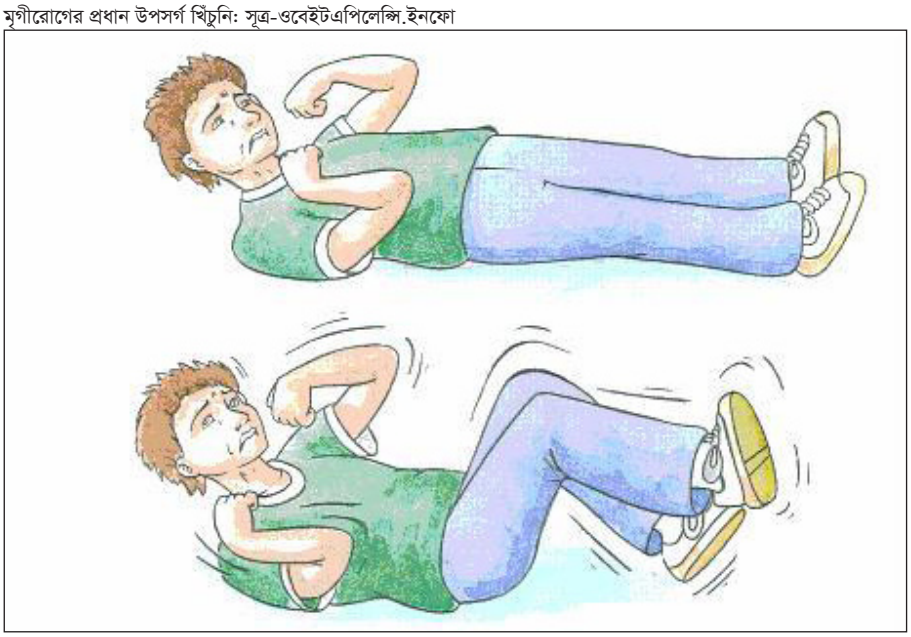

ভেতরের পাতায়

- ব্রংকিয়াল অ্যাজমা বা হাঁপানি
- মেডুলারি স্পঞ্জ কিডনি
- পরজীবীঘটিত ডায়রিয়া

বর্ষ ২৪ | সংখ্যা ২

অগ্রহায়ণ ১৪২২ | ডিসেম্বর ২০১৫

ISSN 1021-2078

icddr,b

আইসিডিডিআর,বি উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	অধ্যাপক জন ডি. ক্লেমেন্স
উপ-প্রধান সম্পাদক	ডাঃ প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
সম্পাদক	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

সদস্য

ডাঃ রুখসানা গাজী, ডাঃ মোঃ ইকবাল,
ড. রুবহানা রকিব, ডাঃ এসএম রফিকুল ইসলাম,
ড. শামসুন নাহার, ডাঃ মারুফা সুলতানা

সহযোগিতায়	হামিদা আক্তার
পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা সম্পাদক বরাবর ডাকযোগে বা ইমেইল-এর মাধ্যমে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৯৮২৭০০১-১০
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: hasib@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: প্রিন্টলিঙ্ক প্রিন্টার্স, ঢাকা

একটি নতুন ধরনের ওষুধ দিলাম। দুই মাস পর রুপা ছেলেসহ আমার বাসায় মিষ্টি নিয়ে হাজির। নাইমকে অনেক প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিলো। রুপার চোখে-মুখে এক ধরনের প্রশান্তি। এই দুই মাস নাইমের খিঁচুনি হয় নি। এরপর প্রায় ছয় মাস রুপার দেখা নেই। নিশ্চয়ই নাইম ভালো আছে। সাত মাসের মাথায় রুপা জানালো নাইমের আবার খিঁচুনি হচ্ছে। বাধ্য হয়ে আমি আবার একটি নতুন ধরনের ওষুধ দিলাম, তবে নতুন ওষুধগুলো বেশ দামী। এরপরও রুপা মাসের ২০-২৫ দিনের ওষুধ কিনতে সমর্থ ছিলো। কিন্তু সে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো তখন, যখন ও যে পার্লারে কাজ করত সেটা বন্ধ হয়ে গেল। শেষবার ও আমার কাছে এসেছিলো মাস ছয়েক আগে। ক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারা। ছেলের জন্য কোথাও থেকে ওষুধ বা ওষুধ কেনার টাকা পাওয়ার আশায় ও আমাকে দিয়ে একটি দরখাস্ত লিখিয়ে নিলো। আমি জানি না আমার দরখাস্ত রুপার কাজে লেগেছিলো কি না।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সি কী?

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সি একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা যা আমাদের মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক কার্যকারিতার কারণে হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের নানা স্থান থেকে খিঁচুনীর সূত্রপাত হতে পারে। মস্তিষ্কের অবস্থানভেদে এই মৃগীরোগের ধরনও বিভিন্ন হয়। সর্বসাধারণের কাছে মৃগীরোগের স্বাভাবিক প্রকাশ হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে সারা শরীরের মাংসপেশী খিঁচতে থাকা।

সব খিঁচুনি কিন্তু মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সি নয়। শরীরে কোনো সমস্যার কারণে খিঁচুনি হতে পারে। কিন্তু তা যদি সংশোধনযোগ্য হয় আমরা তাকে মৃগীরোগ বলবো না। উদাহরণস্বরূপ, শরীরে লবণের পরিমাণ কমে গেলে ধারাবাহিকভাবে খিঁচুনি হতে পারে, যা এপিলেপ্সি নয়। তেমনি শরীরে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলেও খিঁচুনি হয় যা এপিলেপ্সি নয়, কারণ এই খিঁচুনি লবণ বা গ্লুকোজের মাত্রা সংশোধন করলে ঠিক হয়ে যায়। সুতরাং, এপিলেপ্সি হচ্ছে কেবলমাত্র মস্তিষ্ক থেকে সৃষ্ট খিঁচুনি যা সাধারণত দীর্ঘসময় ধরে বার বার হয়ে থাকে। বিশ্বজুড়ে মৃগীরোগীর হার প্রতি হাজারে ৫ থেকে ১০ জন।

মৃগীরোগের প্রকারভেদ

মৃগীরোগের প্রকারভেদ করা হয়ে থাকে রোগের প্রকাশ এবং মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক প্রবাহের ধরনভেদে। সার্বিকভাবে মৃগীরোগকে আংশিক বা অবস্থান-নির্দিষ্ট এপিলেপ্সি (ফোকাল) এবং সামগ্রিক বা জেনারেলাইজড এপিলেপ্সি এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

আংশিক বা অবস্থান-নির্দিষ্ট এপিলেপ্সি বা ফোকাল এপিলেপ্সি

শরীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্য আমাদের মস্তিষ্কে বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। এইসব নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের এপিলেপ্সি বা মৃগীরোগ হতে পারে। একারণেই একে অবস্থান-নির্দিষ্ট বা ফোকাল এপিলেপ্সি বলে। চেতনার তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে এই ফোকাল এপিলেপ্সিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

সচেতন অবস্থার অবস্থান-নির্দিষ্ট এপিলেপ্সি

এই ধরনের এপিলেপ্সিতে চেতনার তারতম্য ঘটে না। রোগী সম্পূর্ণ সজাগ থাকে এবং তার স্নায়বিক অস্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ বর্ননা করতে পারে। এই জাতীয় এপিলেপ্সিতে সুনির্দিষ্টভাবে মাংসপেশীর সঞ্চালন, সংবেদনশীলতা, স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু বা মনস্তাত্ত্বিক অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে মাংসপেশীর অস্বাভাবিক সঞ্চালনজনিত এপিলেপ্সিই বেশি পরিলক্ষিত হয়। এতে মস্তিষ্কের একদিকের মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণের যে নির্দিষ্ট স্থান বা মটর এরিয়া আছে সেখান থেকে মটর স্নায়ুকোষের অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক প্রবাহ শুরু হয়। আস্তে আস্তে তা কিছুটা ছড়াতে পারে কিন্তু কখনোই তা মস্তিস্কের অপর পাশ আক্রান্ত করে না। মস্তিষ্কের যে পাশ আক্রান্ত হয় শরীরে তার বিপরীত পাশের মাংসপেশীতে খিঁচুনি হয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় রোগীর কোনো এক দিকের হাত, পা বা মুখের মাংসপেশী বারবার ঝাঁকি খাচ্ছে। হাত বা পায়ের কোনো অংশ থেকে খিঁচুনি শুরু হয়ে শরীরের একই পার্শ্বের বিভিন্ন মাংসপেশীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। একে জ্যাকসনিয়ান মার্চ বলে। কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট পর্যন্ত এই খিঁচুনি চলতে পারে। খিঁচুনি বন্ধ হওয়ার পর আক্রান্ত অঙ্গ অসাড় বা প্যারালাইজড হয়ে পড়তে পারে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত। একে টডস পালসি বলা হয়ে থাকে। যদিও বিরল, তবে এই ধরনের মৃগীরোগের স্থায়িত্ব কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিনও থাকতে পারে যাকে অবিরাম আংশিক মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সিয়া পার্শিয়ালিস কন্টিনিউয়া বলে।

এছাড়া বোধের অস্বাভাবিক সংবেদনশীলতা (সেনসরি এপিলেপ্সি), দৃষ্টি বিভ্রম, ঘ্রাণের অস্বাভাবিক অনুভূতি, ভারসাম্যহীনতা (শারীরিক বা মানসিক) বা স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের অস্বাভাবিকতা নিয়েও ফোকাল এপিলেপ্সি প্রকাশ পেতে পারে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব এপিলেপ্সি নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ।

অবচেতন অবস্থান-নির্দিষ্ট মৃগীরোগ

এই ধরনের ফোকাল এপিলেপ্সিতে কিছুক্ষণের জন্য রোগী স্বাভাবিক চেতনা হারালেও অজ্ঞান হয়ে পড়ে না। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় রোগী হঠাৎ করেই কিছু সময়ের জন্য অস্বাভাবিক আচরণ করছে। এই সময়টিতে রোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কোনো প্রশ্ন করা হলে উত্তর দেয় না। কোনো আদেশ পালন করতে পারে না।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এধরনের মৃগীরোগের শুরুতে রোগী শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এসময় রোগী অবচেতন অবস্থায় নানা ধরনের কার্যকলাপ করে থাকে, যেমন ক্রমাগত চিবুতে থাকা, ঢোক গেলা বা ঠোঁট দিয়ে শব্দ করা, হাতের আঙুল দিয়ে কিছু খুটতে থাকা, হাসা বা কান্না, এমনকি দৌড়াতেও পারে। এই অস্বাভাবিক কার্যকলাপগুলো করার পরই রোগী মানসিকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে তার কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা লাগতে পারে। সম্পূর্ণ চেতনায় আসার পর রোগী মৃগীরোগকালীন অস্বাভাবিক আচরণের কোনো কিছুই মনে করতে পারে না। এধরনের মৃগীরোগের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মৃগীরোগ-পূর্ববর্তী অনুভূতি, যাকে 'অরা' বলা হয়। মৃগীরোগ শুরুর একটু আগে রোগী সাধারণত অস্বাভাবিক কোনো গন্ধ, শব্দ, স্বাদ পেতে পারে বা দৃশ্য দেখতে পারে, এমনকি রোগীর কাছে পরিচিত জায়গা অপরিচিত বা অপরিচিত জায়গা পরিচিত মনে হতে পারে। রোগী অস্বাভাবিক ভয় পেতে পারে বা তার কাছে পারিপার্শ্বিক ঘটনা, পরিবেশ, এমনকি নিজেকেও অবাস্তব ও অলীক মনে হতে পারে। এই অরার ধরন দেখে মস্তিষ্কে মৃগীরোগের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই মৃগীরোগের উৎপত্তিস্থল মস্তিষ্কের টেমপোরাল লোব-নামক স্থান, যা টেমপোরাল লোব এপিলেপ্সি বা কমপ্লেক্স পার্শিয়াল সিজার নামেও পরিচিত।

আংশিক বা অবস্থান-নির্দিষ্ট এপিলেপ্সি বা ফোকাল এপিলেপ্সি

এই মৃগীরোগে মস্তিষ্কের দুই পাশই আক্রান্ত হয়। মস্তিষ্কের এক পাশ থেকে এটি শুরু হয়ে তৎক্ষণাত স্নায়ুকোষের এই অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক প্রবাহ পুরো মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ শরীরের উভয় পাশেই খিঁচুনির আলামত প্রকাশ পায়। নিম্নোক্ত বিভিন্ন ধরনের জেনারালাইজড এপিলেপ্সি দেখা যায়:

জেনারেলাইজড টনিক ক্লনিক মৃগীরোগ

শুরু থেকেই এই মৃগীরোগে শরীরের অধিকাংশ মাংসপেশী প্রবলভাবে খিঁচতে থাকে। সাধারণত হঠাৎ করেই কোনো পূর্ববর্তী আলামত বা অরা ছাড়াই খিঁচুনি হয়। তবে কিছু রোগীর খিঁচুনি শুরুর ঘণ্টাখানেক আগে থেকে নানারকম অস্বস্তিকর উপসর্গ হতে পারে যা থেকে রোগী বুঝতে পারে যে খিঁচুনি শুরু হবে। একে 'প্রড্রম' বলা হয়। অরার মতো প্রড্রমের কোনো সুনির্দিষ্ট আলামত নেই। মৃগীরোগের শুরুতে রোগীর সারা শরীরের মাংসপেশীর একযোগে সংকোচন ঘটে এবং রোগী অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। শ্বাসপ্রশ্বাসে সহায়ক মাংসপেশী এবং স্বরতন্ত্রের মাংসপেশীর একযোগে সংকোচনের ফলে রোগীর গলা দিয়ে তীক্ষ্ণ শব্দ বেরিয়ে আসে। চোখ উল্টে যায় এবং মুখ থেকে অতিরিক্ত লালা ঝরতে থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস

প্রচণ্ড খিঁচুনির ফলে তীব্রভাবে কাঁপছে মৃগীরোগে আক্রান্ত একটি শিশু: সূত্র-বিহ্যান্স.কম

কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে ফলে রোগী অক্সিজেনের অভাবে নীলাভ হয়ে যায়। চোয়ালের মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে রোগীর জিহ্বায় কামড় লেগে জিহ্বা কেটে যেতে পারে। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের অত্যধিক সক্রিয়তার ফলে রোগীর হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ বেড়ে যায়। দশ থেকে ২০ সেকেন্ড পরে রোগীর শরীরের মাংসপেশী ক্রমাগত সংকুচিত ও শিথিল হতে থাকে। দেখে মনে হয় রোগীর সমস্ত শরীর ঝাঁকাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট পর্যন্ত এই খিঁচুনি চলতে থাকে। খিঁচুনি শেষ হলে রোগী অচেতন ও অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। এসময় নিজের অজান্তে রোগী মলমূত্র ত্যাগ করে ফেলতে পারে। কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রোগী ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পায়। এই সময়টিতে রোগী আশপাশের জগৎ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে এবং এরপর এই দ্বিধাগ্রস্ততা কেটে গেলে কয়েক ঘণ্টা ধরে রোগীর মাথায় বা শরীরের মাংসপেশীতে ব্যথা থাকতে পারে বা সে অস্বাভাবিক ক্লান্তিবোধ করতে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে মৃগীরোগ হলে বা রোগীর মস্তিষ্কে বয়সজনিত কোনো অস্বাভাবিকতা থাকলে মৃগীরোগ-পরবর্তী অবচেতন অবস্থা বা দ্বিধাগ্রস্ততা অনেক ঘণ্টা পর্যন্ত থাকতে পারে। এই টনিক ক্লনিক মৃগীরোগ যদি পাঁচ মিনিটের বেশি সময় ধরে একটানা চলে বা পাঁচ মিনিটের ভেতর একাধিক বার হয় এবং মৃগীরোগ চলাকালীন সময়ে রোগী অজ্ঞান থাকে তবে এ-অবস্থাকে টনিক ক্লনিক স্ট্যাটাস এপিলেপ্টিকাস বলে, যা একটি জরুরি অবস্থা।

অনুপস্থিতি বা অ্যাবসেন্স এপিলেপ্সি

শিশুদের মধ্যে এধরনের মৃগীরোগ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। মূলত ৫-১০ বছরের শিশু বা বয়ঃসন্ধির শুরুতে এই মৃগীরোগ শুরু হয়। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য রোগী তার পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে মানসিক যোগাযোগ হারায়। এই সময়টিতে রোগী যেন তার চারপাশের ঘটনা থেকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য অনুপস্থিত থাকে। একারণেই একে অনুপস্থিতি বা অ্যাবসেন্স এপিলেপ্সি বলে। রোগী অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায় না। এসময় রোগীর মধ্যে অবস্থান-নির্দিষ্ট বা ফোকাল এপিলেপ্সির মতো অস্বাভাবিক আচরণ দেখা যায়। পার্থক্য হলো এই যে, এই মৃগীরোগে শরীরের দুই পাশেই আলামত থাকে যা ফোকাল এপিলেপ্সিতে থাকে একদিকে। রোগী ক্রমাগত চিবুতে থাকে বা অনবরত দু'চোখ পিটপিট করতে থাকে অথবা দুই হাতে মৃদু ঝাঁকি দিতে থকে। রোগীর কয়েক সেকেন্ডের অবচেতন অবস্থা মুহূর্তেই কেটে যায় এবং সে পুরোপুরি সজাগ হয়ে যায়। টনিক ক্লনিক মৃগীরোগের মতো এক্ষেত্রে মৃগীরোগ-পরবর্তী কোনো অসাড়তা বা অবচেতনতা থাকে না। সারাদিনে অসংখ্য বার (এমনকি কয়েকশতবারও হতে পারে) এই ঘটনা চলতে থাকে। এই মৃগীরোগ এতই ক্ষণকালীন যে রোগী তার এই অস্বাভাবিকতা অভিভাবকের কাছে বলতে পারে না। বাবা-মা বেশিরভাগ সময় মনে করে শিশু যেন প্রায়ই খানিকক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায়। পড়াশুনার মান বা স্কুলের ফলাফল খারাপ হতে থাকে।

তবে আশার কথা হলো সন্দেহ হলে ইলেক্ট্রো-এনসেফালোগ্রাম বা ইইজি পরীক্ষার মাধ্যমে অতি সহজেই এই অ্যাবসেন্স এপিলেপ্সি ধরা পড়ে এবং বিশেষ ধরনের ওষুধে এধরনের মৃগীরোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ব্যতিক্রমী অ্যাবসেন্স এপিলেপ্সি

উপসর্গ একই হলেও কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে মৃগীরোগের শুরু বা শেষ অ্যাবসেন্স এপিলেপ্সির মতো হঠাৎ করে না হয়ে কিছু সময় ধরে হয়ে থাকে এবং অপেক্ষাকৃত বেশি সময় ধরে রোগীর শরীরে অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ পরিলক্ষিত হয়, যেমন চোখ পিটপিট করা, হাতের মৃদু ঝাঁকুনি, ইত্যাদি।

সাধারণত মস্তিষ্কের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে রোগজনিত অস্বাভাবিকতা থাকলে এই ধরনের এপিলেপ্সি হয় এবং এই ধরনের রোগী কিছুটা মানসিক প্রতিবন্ধীও হতে পারে। একারণেই অ্যাবসেন্স এপিলেপ্সির মতো ওষুধ দিয়ে এ-রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

জেনারেলাইজড টনিক ক্লনিক ও অ্যাবসেন্স ধরনের জেনারেলাইজড মৃগীরোগ ছাড়াও ক্ষণকালীন মাংসপেশীর শিথিলতা ও সংকোচনজনিত মৃগীরোগ রয়েছে যেগুলোকে যথাক্রমে টনিক, অ্যাটোনিক এবং মায়োক্লনিক এপিলেপ্সি বলা হয়।

মাংসপেশীর অস্বভাবিক সংকোচনজনিত মৃগীরোগ বা টনিক এপিলেপ্সি

এধরনের মৃগীরোগে শরীরের দুই পাশের হাত, পা বা উভয় অঙ্গেই মাংসপেশীর অস্বাভাবিক সংকোচন ঘটে এবং রোগী অচেতন হয়ে পড়ে। সাধারণত ২০ সেকেন্ডের কম সময় মাংসপেশীর এই সংকোচন স্থায়ী হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘুমের সময় এটি হয়ে থাকে। খিঁচুনি শেষ হওয়ার পর রোগী তন্দ্রাচ্ছন্নতা বা মানসিক দ্বিধাগ্রস্ততায় ভুগতে পারে।

ক্ষণকালীন মাংসপেশীর শিথিলতাজনিত মৃগীরোগ বা অ্যাটোনিক এপিলেপ্সি

এক্ষেত্রে খুবই অল্প সময়ের জন্য রোগীর শরীরের মাংসপেশী শিথিল হয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। ক্ষণিকের জন্য রোগীর সচেতনতায় ব্যাঘাত ঘটে কিন্তু মাংসপেশীর শিথিলতা কেটে যাওয়ার সাথে সাথেই রোগী পূর্ণ চেতনা ফিরে পায়। অর্ধ সেকেন্ড বা তারও কম সময়ের জন্য মাংসপেশীর শিথিলতা থাকলে রোগীর মাথা হয়তো সামনের দিকে হঠাৎ ঝুকে আবার ঠিক হয়ে যায়, যাকে হেড ড্রপ বলে। কিন্তু এর বেশি সময় ধরে মাংসপেশীর শিথিলতা থাকলে রোগী আচমকা মাটিতে পড়ে যায়, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কারণ এতে রোগী মাথায় মারাত্মক আঘাত পেতে পারে।

ক্ষনকালীন মাংসপেশীর সংকোচনজনিত মৃগীরোগ বা মায়োক্লনিক এপিলেপ্সি

মায়োক্লনাস বলতে বোঝায় হঠাৎ ক্ষণকালের জন্য (অর্ধ সেকেন্ড বা তারও কম) শরীরের কোনো অংশ বা সারা শরীরের মাংসপেশীর সংকোচন। পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়ার আগের তন্দ্রাচ্ছন্নতার সময়টিতে মায়োক্লনাস হতে পারে এবং এটিই স্বাভাবিক। তবে যেসব রোগীর মস্তিষ্ক অস্বাভাবিকভাবে ক্রমশ শুকিয়ে যায় (সেরেব্রাল এট্রফি) বা যাদের মস্তিষ্কে পূর্ববর্তী অক্সিজেনের ঘাটতি বা অ্যাসফিক্সিয়া হওয়ার ইতিহাস থাকে তাদের এই ধরনের মৃগীরোগ বেশি হয়।

উল্লেখ্য, এই অ্যাটোনিক বা মায়োক্লনিক এপিলেপ্সিতে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে সাধারণত কিছু নির্দিষ্ট মৃগীরোগ সংবলিত সমষ্টিগত উপসর্গ বা এপিলেপ্সি সিন্ড্রোম দেখা যায়। এইসব এপিলেপ্সি সিন্ড্রোমে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে সাধারণত একাধিক ধরনের মৃগীরোগ দেখা যায়। নিচে উল্লেখযোগ্য কিছু এপিলেপ্সি সিন্ড্রোম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

জুভেনাইল মায়োক্লনিক এপিলেপ্সি

বয়ঃসন্ধির সময় বা ১৪-১৫ বছর বয়স থেকে এই ধরনের মৃগীরোগের উপসর্গ প্রকাশ পেতে শুরু করে। প্রথম প্রথম সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর রোগীর প্রায়ই মায়োক্লনিক মৃগীরোগের মতো শরীরের মাংসপেশীর ক্ষণকালীন সংকোচন ঘটে। কোনো কারণে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলে এই মায়োক্লনাস-এর মাত্রা বেড়ে যায়। বিশদভাবে রোগীর ইতিহাস নিলে দেখা যায় রোগীর হাত, পা বা শরীর সকালের দিকে হঠাৎ করে ঝাঁকি দিয়ে ওঠে এবং হাত থেকে জিনিস পড়ে যায়। পরবর্তীতে এধরনের রোগীরা জেনারেলাইজড টনিক ক্লনিক মৃগীরোগে আক্রান্ত হয় এবং তখন এরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। এধরনের রোগীদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের অ্যাবসেন্স এপিলেপ্সি থাকে। একারণে টনিক ক্লনিক মৃগীরোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে খুব যত্নসহকারে বয়ঃসন্ধির সময়কার এই মায়োক্লনিক এপিলেপ্সির আলামতের ইতিহাস নিতে হয়। এর কারণ হলো বিশেষ ধরনের মৃগীরোগের ওষুধ এই ধরনের মৃগীরোগে কাজ করে কিন্তু কিছু কিছু ওষুধে এই মৃগীরোগের প্রকোপ উল্টো বেড়ে যেতে পারে।

লেনক্স-জ্যাস্টট সিন্ড্রোম

এটি অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের মৃগীরোগ যা দুই থেকে ছয় বছর বয়সের মধ্যে শুরু হয়। লেনক্স-জ্যাস্টট সিন্ড্রোম-এ আক্রান্ত শিশুর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের মৃগীরোগ হয়ে থাকে, যেমন একই শিশুর অ্যাটোনিক, টনিক, অ্যাবসেন্স এবং টনিক ক্লনিক মৃগীরোগের আলামত থাকে। এই শিশুদের অধিকাংশই ধীরে ধীরে মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে। এই মৃগীরোগের চিকিৎসা অত্যন্ত দুরূহ। একাধিক ওষুধেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ-রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ওষুধের পাশাপাশি কম শর্করা ও অধিক চর্বিযুক্ত খাবার এই মৃগীরোগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে।

বয়সভেদে এপিলেপ্সির কারণ

বিভিন্ন বয়সে এপিলেপ্সির কারণও বিভিন্ন। শিশু জন্মের সময় প্রসবকালীন জটিলতা বা বিলম্বিত প্রসবের কারণে অক্সিজেনের অভাব বা ব্যর্থ অ্যাসফিক্সিয়ার ফলে শিশুর মস্তিষ্কের ক্ষতি শিশুদের এপিলেপ্সি হওয়ার প্রধান কারণ। এছাড়া মস্তিষ্কের আবরণ (যাকে আমরা মেনিনজেস বলি) বা মস্তিষ্কে জীবাণুর সংক্রমণজনিত মেনিনজাইটিস, এনসেফালাইটিস, মস্তিষ্কের জন্মগত ত্রুটি, প্রভৃতি কারণে শিশুদের পরবর্তীকালে মৃগীরোগ হতে পারে। জন্মের দুই মাস থেকে ১২ মাস-বয়সী শিশুদের মধ্যে সাধারণত ব্যর্থ অ্যাসফিক্সিয়া বা মস্তিষ্কের জন্মগত ত্রুটির কারণে ইনফেন্টাইল স্পাজম-নামক মৃগীরোগ হয়ে থাকে। এই ধরনের মৃগীরোগে আক্রান্ত শিশুর শরীর থেকে থেকে ঝাঁকি দিয়ে ওঠে। সারা দিনে অসংখ্য বার এটি হতে থাকে। ধীরে ধীরে শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে পড়তে পারে এবং প্রায় ৭৫% শিশুর পরবর্তীতে মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সি দেখা দেয়।

ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর-বয়সী শিশুদের মধ্যে ৩%-৫%-এর জ্বরজনিত মৃগীরোগ বা ফেব্রাইল সিজার হয়ে থাকে। সাধারণত এই মৃগীরোগের ধরন টনিক ক্লনিক-এর মতো হলে, ১৫ মিনিটের কম সময় ধরে অব্যাহত থাকলে এবং জ্বরের প্রথম ২৪ ঘণ্টায় এটি হলে একে সাধারণ জ্বরজনিত খিঁচুনি বা সিম্পল ফেব্রাইল সিজার বলে। এর ব্যত্যয় ঘটলে, যেমন জ্বর শুরুর ২৪ ঘন্টা পর খিঁচুনি, ১৫ মিনিটের বেশি স্থায়িত্বকাল বা অবস্থান-নির্দিষ্ট বা ফোকাল মৃগীরোগের আলামত থাকলে তাকে যৌগিক বা কমপ্লেক্স ফেব্রাইল সিজার বলে। ফেব্রাইল সিজারে আক্রান্ত ৩০% শিশুর দ্বিতীয়বার এবং ১০%-এর তিন বা তার বেশিবার ফেব্রাইল সিজার হয়ে থাকে। ফেব্রাইল সিজারে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে ৩%-এর পরবর্তী সময়ে মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে ফেব্রাইল সিজারে আক্রান্ত হওয়ার সাথে বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া, মস্তিষ্ক বা এর আবরণের সংক্রমণ কিংবা মস্তিষ্কের জন্মগত ত্রুটি থাকার কোনো সম্পর্ক নেই।

পাঁচ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে সাধারণত মেডিয়াল টেমপোরাল লোব এপিলেপ্সি, জুভেনাইল মায়োক্লনিক এপিলেপ্সি এবং লেনক্স-জ্যাস্টট সিন্ড্রোম এই তিন ধরনের মৃগীরোগের উপসর্গ প্রকাশ পেতে থাকে। এছাড়া কিছু শিশুর মধ্যে সামগ্রিক বা জেনারালাইজড টনিক ক্লনিক মৃগীরোগ দেখা দিতে পারে, যার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না বা এগুলোর উপসর্গ উপরোক্ত তিন ধরনের এপিলেপ্সির সঙ্গে মেলেও না। একে অজানা কারণজনিত মৃগীরোগ বা ইডিওপ্যাথিক এপিলেপ্সি বলে।

বয়ঃসন্ধিকালে বা ১৫-২০ বছর বয়সে যে মৃগীরোগের সূচনা হয় সেক্ষেত্রে কারণ হিসেবে প্রাধান্য পায় মাথার গুরুতর আঘাত, মস্তিষ্কে সংক্রমণ বা টিউমার, এবং ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া। বিশেষ করে মাথায় গুরুতর আঘাতের কারণে মাথার হাড় ভেঙে যাওয়া, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা আঘাত-পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদী অচেতন অবস্থা বা স্মৃতিভ্রম ঘটলে পরবর্তীতে মৃগীরোগ হওয়ার সম্ভাবনা ৪০%-৫০% বেড়ে যায়। পরিণত বা বৃদ্ধ বয়সে স্ট্রোক (মস্তিষ্কে আঘাত ছাড়াই রক্তক্ষরণ বা রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত), মস্তিষ্কের টিউমার, মাথায় আঘাত এবং ক্রমশ মস্তিষ্ক শুকিয়ে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট অসুখ মৃগীরোগের প্রধান কারণ।

মৃগীরোগ নির্নয়

প্রাথমিকভাবে রোগীর সত্যিই মৃগীরোগ আছে কি না তা বোঝার জন্য রক্তের কিছু পরীক্ষা করা জরুরী কারণ বিপাকীয় বা মেটাবলিক কিছু অস্বাভাবিকতায় খিঁচুনি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এর মধ্যে রক্তে লবণ বা ইলেক্ট্রোলাইটসের মাত্রা, গ্লুকোজ, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের মাত্রা পরীক্ষা করা উচিত। কোনো ওষুধের বিষক্রিয়ার সন্দেহ থাকলে সেটিও পরীক্ষা করে দেখা উচিত। এছাড়া থাইরয়েড হরমোনের মাত্রাও পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

ইইজি বা ইলেক্ট্রো-এনসেফালোগ্রাম

মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক প্রবাহ নির্ণয়ে ইইজি করা হয়। এই পদ্ধতিতে মস্তিষ্কের উপরিভাগের অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক প্রবাহ সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়। কিন্তু মৃগীরোগের উৎস যদি মস্তিষ্কের গভীরে হয় তাহলে এই পরীক্ষায় তা ধরা না-ও পড়তে পারে। এছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তির মৃগীরোগের মধ্যবর্তী সময়ের ইইজি ৬০% ক্ষেত্রে স্বাভাবিক থাকতে পারে। ইইজির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট কয়েক প্রকার মৃগীরোগ সনাক্ত করা সম্ভব যা রোগীর চিকিৎসায় অত্যন্ত জরুরি।

মস্তিষ্কের এমআরআই

মৃগীরোগে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক বা বৃদ্ধ রোগীদের ক্ষেত্রে অবশ্যই এমআরআই করাতে হবে কারণ এক্ষেত্রে মস্তিষ্কের দৃশ্যমান অস্বাভাবিকতা থেকে মৃগীরোগের শুরু হয়, যেমন স্ট্রোক, ব্রেইন টিউমার, ইত্যাদি। শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে অ্যাবসেন্স এপিলেপ্সিতে এমআরআই করার প্রয়োজন নেই কারণ এতে সুনির্দিষ্ট ইইজি-র পরিবর্তন থাকে যা রোগ নির্ণয়ে যথেষ্ট।

মৃগীরোগের চিকিৎসা

মৃগীরোগের ধরন বা কারণ যাই হোক, এর চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী। একাধিক বার অজানা কারণে খিঁচুনি হলে বা কারণ সংশোধনযোগ্য না হলে রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মৃগীরোগের ওষুধ শুরু করতে হবে। তবে মাথায় মারাত্মক আঘাত, সংক্রমণ, স্ট্রোক বা টিউমারের কারণে মৃগীরোগ হলে প্রথমবার রোগের বহিঃপ্রকাশের পরই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ শুরু করা উচিত, কারণ বারবার মৃগীরোগ হওয়ার আশংকা এসব ক্ষেত্রে অনেক বেশি। ওষুধ শুরু করার পর টানা দুই বছর রোগী খিঁচুনিমুক্ত থাকলে ধীরে ধীরে (দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে) মৃগীরোগের ওষুধ বন্ধ করতে হবে।

শতকরা ৬০-৭০ জন রোগীর ক্ষেত্রে এক ধরনের ওষুধেই মৃগীরোগ নিয়ন্ত্রনে থাকে। তবে এক-তৃতীয়াংশ রোগীর ক্ষেত্রে একের অধিক ধরনের ওষুধ প্রয়োজন হয়। মৃগীরোগের চিকিৎসায় প্রথম সারির ওষুধগুলোর মধ্যে রয়েছে ফেনাইটোইন, কার্বামাজেপাইন, ভ্যালপ্রইক এসিড, অক্সকাবাজেপাইন ও লেমোট্রিজিন। এইসব ওষুধে কাজ না হলে চিকিৎসকরা দ্বিতীয় সারির ওষুধের মধ্যে লিভেটাইরাসিটাম, টোপিরামেট ও জানিসামাইড ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া ইথোমক্সিমাইড, ক্লোনাজেপামও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

একাধিক ওষুধের সাহায্যেও অনিয়ন্ত্রিত মৃগীরোগের চিকিৎসা করা হয়। টেমপোরাল লোব এপিলেপ্সি-র ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করে মস্তিষ্কের টেমপোরাল লোব-এর বিশেষ অংশ ফেলে দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃগীরোগ পুরোপুরি সেরে যায়।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সি একটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যাধি। এ-রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মৃগীরোগ সম্পর্কে ধারণা। গণসচেতনতা এবং সামাজিক সহানুভূতিশীলতা রোগীকে চলার পথে হীনমন্যতামুক্ত ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে সাহায্য করবে। ■

ব্রংকিয়াল অ্যাজমা বা হাঁপানি

ডাঃ মোঃ সফিকুল ইসলাম, আইসিডিডিআর,বি

ডাঃ মোঃ মাহবুব ইসলাম, কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

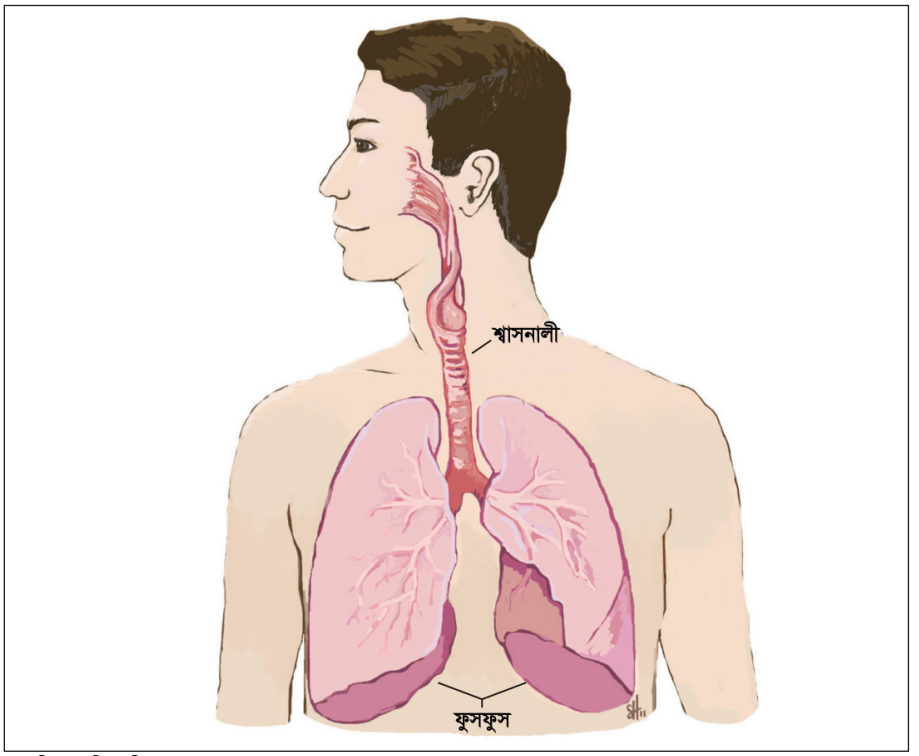

সূত্র-ফ্লিকার ক্রিয়েটিভ কমনস

মানবদেহের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর মধ্যে ফুসফুস অন্যতম। আমাদের দেহে এক জোড়া ফুসফুস বা লাংস আছে। ফুসফুসের প্রধান কাজ হচ্ছে আমাদের দেহে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন প্রবেশ করানো ও অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বের করে দেওয়া। এই প্রক্রিয়াকে শ্বসন বা রেসপিরেশন বলা হয়। এই প্রক্রিয়াটি সম্পাদনের জন্য ফুসফুসের ভেতরে ও বাইরে অসংখ্য ছোট বড় শ্বাসনালী বা ব্রঙ্কাস রয়েছে। ব্রংকিয়াল অ্যাজমা বা হাঁপানি মূলত শ্বাসনালীর একটি বিশেষ রোগ। একজন সুস্থ মানুষের ফুসফুস তার শ্বাসনালীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অক্সিজেন নিতে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করতে সক্ষম, কিন্তু অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগীদের শ্বাসনালী ক্ষেত্র বিশেষে সরু হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের ফুসফুস তা করতে পারে না। এর ফলে রোগীরা শ্বাসকষ্টে ভোগে। এটিই চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্রংকিয়াল অ্যাজমা নামে পরিচিত।

রোগের ব্যাপকতা

এক সময় মনে করা হতো যে, অ্যাজমা বা হাঁপানি ইউরোপ, আমেরিকা অথবা আমাদের সমাজের অভিজাত শ্রেণীর রোগ। কিন্তু তা ঠিক নয়, সব শ্রেণীর মানুষেরই এ-রোগ হতে পারে। আমাদের দেশেও সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এ-রোগটি দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই রোগীরা লক্ষণবিহীন অবস্থায় থাকে বলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে চায় না। আমাদের দেশের জনগোষ্ঠির প্রায় ১০% মানুষের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় এই রোগ বিদ্যমান।

রোগের কারণ

ব্রংকিয়াল অ্যাজমার জন্য দু'টি বিশেষ কারণকে চিহ্নিত করা হয়েছে:

১. বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতা

২. পরিবেশগত

হাঁপানিকে প্রধানত বংশানুক্রমিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ-রোগের বংশগতি একটি জটিল বিষয়। বাবা-মা, নানা-নানী, দাদা-দাদী, ফুপু, খালা এরকম রক্তের সম্পর্কের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে এই রোগের ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়। তবে বংশগত ধারাবাহিকতা ছাড়াও এই রোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। আমাদের দেশের অনেক

রোগী বংশগত ধারাবাহিকতার সঠিক ইতিহাস বলতে পারে না, আবার অনেক রোগী (বিশেষত মহিলারা) ইচ্ছাকৃতভাবে তা গোপন করে থাকে। ফলে অনেক সময় রোগ নির্ণয়ে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়।

পরিবেশ ও জলবায়ু এ-রোগের আর একটি অন্যতম কারণ। নোংরা পরিবেশে এ-রোগের মাত্রা বেড়ে যায়। মোটরগাড়ি, চুলা ও কল-কারখানার ধোঁয়া এবং ধুলা রোগীর শ্বাসকষ্টকে বাড়িয়ে দেয়।

রোগের লক্ষণ বা উপসর্গ

সাধারণত হাঁপানি বা অ্যাজমা রোগীরা নিম্নোক্ত লক্ষণ প্রকাশ করে থাকে:

১. শ্বাসকষ্ট

২. দীর্ঘদিন যাবত কাশি

৩. শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে বুকে অস্বাভাবিক শব্দ করা

৪. বুকে চাপ অনুভব করা

অ্যাজমা রোগের লক্ষণগুলো বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়। দীর্ঘদিনের কাশি ও শ্বাসকষ্ট এ-রোগের দু'টি প্রধান লক্ষণ। কিছু রোগীর শ্বাসের সাথে বাঁশির মত শব্দ হয় অথবা শ্বাসকষ্টের সময় তারা বুকে চাপ অনুভব করে। এ-রোগের প্রবণতা পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

অ্যাজমায় আক্রান্ত রোগীরা বিশেষ কোনো খাবার, সুগন্ধি, ফুলের রেণু, ঠাণ্ডা বাতাস, ময়লা পরিবেশ, গৃহপালিত প্রাণীর লোম, মেঝের কার্পেটের ময়লা, ধুলাবালি, ধোঁয়া প্রভৃতির প্রতি সংবেদনশীল হয়ে থাকে। এ-রোগে আক্রান্ত রোগীরা সকালে অপেক্ষাকৃতভাবে সুস্থ থাকে এবং বিকেল হলেই অসুস্থতার প্রবণতা বেড়ে যায় এবং রাতে আরো প্রকট হয়।

রোগনির্ণয়

অ্যাজমা রোগ নির্ণয়ে বিশেষ কোনো ব্যায়বহুল পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ দেখেই চিকিৎসা প্রদান করে থাকেন। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচ্য:

১. রোগীর বয়স

২. রোগীর লিঙ্গ

৩. পরিবারের অ্যাজমা-র ইতিহাস

৪. রোগী ধূমপায়ী কি না

সাধারনত ১৫-২৫ বছর বয়সের রোগীরা এ-রোগের লক্ষণ নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়, যাদের একটি বিশাল অংশ নারী। অ্যাজমা রোগের সাথে বিশেষ একটি রোগের কিছু সামঞ্জস্য রয়েছে। এ-রোগটি ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি) নামে পরিচিত। এ-রোগে আক্রান্ত রোগীরাও কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে শব্দ করা এসব লক্ষণ নিয়ে আসতে পারে। সিওপিডি-তে আক্রান্ত রোগীরা সাধারণত ধূমপায়ী হয়ে থাকে, যাদের অধিকাংশই পুরুষ, মধ্যবয়স্ক বা বৃদ্ধ।

চিকিৎসা

আমাদের দেশে অ্যাজমা রোগীদের চিকিৎসা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বিভিন্ন সময় তারা অ্যাজমার চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচারের শিকার হয়। 'হাঁপানি থেকে চিরমুক্তি' '২৪ ঘণ্টায় ফলাফল', ইত্যাদি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনের খপ্পরে পড়ে অনেকেই প্রতারিত হয়। যারা এ-ধরনের প্রতারণার ফাঁদ পাতে তারা কিছু ওষুধ বিক্রি করে থাকে, যাতে স্টেরয়েডজাতীয় উপাদান থাকে বলে সাময়িকভাবে হাঁপানি থেকে রোগীরা মুক্তিলাভ করলেও পরবর্তীতে অনেক জটিলতার শিকার হয়।

এজন্য রোগীদের যে বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে তা হলো, অ্যাজমা পুরোপুরি নিরাময়যোগ্য নয়। ডায়াবেটিস রোগীদের মতো প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা এ-রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা অ্যাজমা চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার ইনহেলার দিয়ে থাকেন।

আমাদের সমাজে একটি প্রচলিত ভুল ধারণা রয়েছে যে, ইনহেলার ব্যবহার করলে হৃদরোগের সম্ভাবনা থাকে অথবা ইনহেলার একবার ব্যবহার শুরু করলে সারা জীবন তা ব্যবহার করতে হয়—এসব কথা ভিত্তিহীন ও অবৈজ্ঞানিক। ইনহেলার দিয়ে চিকিৎসা করা অ্যাজমা রোগীর জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং নিয়মিত ইনহেলার দ্বারা চিকিৎসায় ক্রমান্বয়ে ইনহেলারের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা যায়। ইনহেলারের আরো বহুবিধ সুবিধা রয়েছে:

১. ট্যাবলেট জাতীয় ওষুধে বিভিন্ন রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, যেমন বুক ধড়ফড় করা, মুখমণ্ডল/শরীর ফুলে যাওয়া, কিডনির সমস্যা হওয়া, রক্তে চর্বির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, ডায়াবেটিস বেড়ে যাওয়া, ইত্যাদি। অথচ ইনহেলার শুধু ফুসফুসের শ্বাসনালীতে কাজ করে বিধায় সেটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে নিরাপদ।

২. ট্যাবলেটজাতীয় ওষুধের চেয়ে ইনহেলার-এর কার্যকারিতা অনেক বেশি দ্রুত। কারণ ইনহেলার সরাসরি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অর্থাৎ শ্বাসনালীতে কাজ করে বিধায় এটি অতি দ্রুত শ্বাসকষ্ট কমায়।

৩. দীর্ঘদিন ইনহেলার ব্যবহারের দ্বারা রোগীর শ্বাসনালীর পরিবর্তন (সংকুচিত হয়ে যাওয়া, শ্লেষ্মা জমে যাওয়া, শ্বাসনালীর অভ্যন্তরের মাংসপেশী শক্ত ও মোটা হয়ে যাওয়া) রোধ করা সম্ভব।

তবে ইনহেলার-এর মাধ্যমে সঠিক চিকিৎসা পেতে হলে রোগীকে অবশ্যই রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ইনহেলারের সঠিক ব্যবহার জানতে হবে। বিশেষত স্পেসার নামক বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা ইনহেলারের ব্যবহার শিখতে হবে এবং তা নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করে যেতে হবে। রোগের মাত্রা বেশি হলে ইনহেলার ছাড়াও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, অ্যাজমা বা হাঁপানিতে ব্যবহৃত সব ওষুধ/ইনহেলার গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য নিরাপদ।

প্রতিরোধ

অ্যাজমা বা হাঁপানি প্রতিরোধ বলতে রোগের লক্ষণসমূহ প্রতিরোধ করাকে বোঝায়। সাধারণভাবে, একজন অ্যাজমা রোগী বছরের অধিকাংশ সময় স্বাভাবিক জীবনযাপন করে থাকে। ফুসফুসের যেকোনো ধরনের সংক্রমণ, ঋতু পরিবর্তন, অ্যাসপিরিন বা এ-জাতীয় ওষুধের ব্যবহার, অতিরিক্ত ধোঁয়া অথবা ধুলাবালি, অতিরিক্ত পরিশ্রম, ইত্যাদি অ্যাজমা রোগীর স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত করে। তাই ইনহেলার বা ওষুধের সাথে সাথে কিছু বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত, যেমন:

১. যেসব খাবার বা জিনিসের প্রতি রোগী সংবেদনশীল, অর্থাৎ যা রোগীর হাঁপানিকে বাড়িয়ে তোলে সেসব পরিহার করা

২. অনেক সময় যেসব খাবার খেলে অ্যালার্জি হয় সেসব খাবার পরিহার করতে গিয়ে পুষ্টিকর অনেক খাবার, যেমন ইলিশ মাছ, মাংস, চিংড়ি, ডাল, শাক-সব্জি প্রভৃতি খাওয়া থেকে রোগীরা বিরত থাকে। মনে রাখতে হবে যে, একজন রোগীর সব খাবারে অ্যালার্জি না-ও থাকতে পারে। কোন কোন খাবার থেকে তার অ্যালার্জি হয় তা বোঝার চেষ্টা করা এবং সেইসব খাবারগুলো পরিহার করাই ভালো

৩. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ধূমপান থেকে দূরে থাকা এবং যতদূর সম্ভব দূষণমুক্ত পরিবেশে থাকা

৪. শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা

৫. নিয়মিতভাবে শরীরচর্চা করা, কারণ তা অ্যাজমা রোগীর জন্য সহায়ক

৬. সবসময় সাথে ইনহেলার রাখা। মনে রাখতে হবে এটি বিপদে বন্ধু হিসেবে কাজ করে

৭. অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সাথে সাথে নিকটস্থ ক্লিনিক বা হাসপাতালে যাওয়া বা কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শমতো চিকিৎসা নেওয়া

ব্রংকিয়াল অ্যাজমা বা হাঁপানি একটি অনিরাময়যোগ্য রোগ হলেও তার লক্ষণসমূহ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এজন্য দরকার রোগের ধরন, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। সমাজের প্রচলিত ভুল ধারণার অবসান ঘটিয়ে সঠিক চিকিৎসা ও প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রত্যেক অ্যাজমা রোগীর স্বাভাবিক জীবনযাপন হোক আমাদের কাম্য। ■

মেডুলারি স্পঞ্জ কিডনি

ডাঃ মোঃ ফজলুল কবীর পাভেল, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

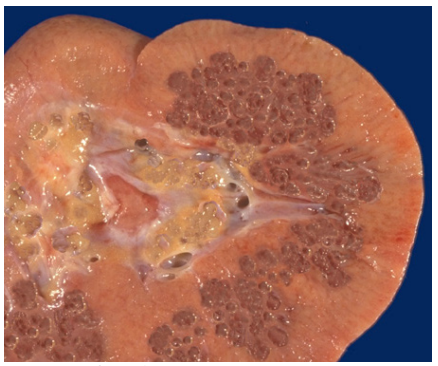

সূত্র-প্যাথোলজিআউটলাইনস.কম

মানুষের শরীরে দু'টি কিডনি থাকে, যার আকৃতি অনেকটা শিমের বিচির মতো। দু'টি কিডনিই যৌথভাবে কাজ করে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। যদিও দু'টি কিডনিই শরীরের জন্য অপরিহার্য অঙ্গ, সৌভাগ্যের বিষয় হলো, একটি কিডনি বিকল হয়ে গেলেও অন্য কিডনিটির দ্বারা মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। কিডনিতে বিভিন্ন ধরনের অসুখ হয়ে থাকে। মেডুলারি স্পঞ্জ কিডনি নামে একটি রোগ তার মধ্যে অন্যতম।

মেডুলারি স্পঞ্জ কিডনি কী?

কিডনির দু'টি অংশ থাকে। একটিকে বলে কর্টেক্স এবং অপরটি মেডুলা। কিডনির মেডুলা অংশে কোনো কারণে সিস্ট তৈরি হলে তা দেখতে অনেকটা স্পঞ্জের মতো লাগে এবং এই কারণে এটিকে মেডুলারি স্পঞ্জ কিডনি বলে। অনেকের মধ্যে জন্ম থেকেই মেডুলারি স্পঞ্জ কিডনি রোগটি থাকে। তবে ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সের আগে কোনো উপসর্গ দেখা যায় না। আমাদের দেশে যদিও মেডুলারি স্পঞ্জ কিডনি-সংক্রান্ত কোনো পরিসংখ্যান নেই, তবে তার মানে এই নয় যে, আমাদের দেশে এ-রোগে কেউ আক্রান্ত হয় না।

রোগের কারণ

এই অসুখের কারণ আজ পর্যন্ত পুরোপুরি জানা সম্ভব হয় নি।

লক্ষণ বা উপসর্গ

মেডুলারি স্পঞ্জ কিডনিতে বেশ কিছু উপসর্গ দেখা যায়, যেমন:

১. পেট ব্যথা করা। তবে সবসময় যে পেটে ব্যথা হয় তা নয়। অনেক সময় পিঠের নিচের দিকে এবং কুঁচকির দিকেও ব্যথা হয়
২. প্রস্রাবে রক্ত যওয়া
৩. প্রস্রাবে জ্বালা-পোড়া করা
৪. শরীরে জ্বর থাকা
৫. বমিবমি ভাব বা বমি হওয়া
৬. ঘোলাটে প্রস্রাব হওয়া

উল্লেখ্য, এ-রোগে ৩০ বছর বয়সের আগে সাধারণত কোনো উপসর্গ লক্ষ্য করা যায় না।

রোগনির্ণয়

মেডুলারি স্পঞ্জ কিডনি নির্ণয়ের জন্য ভালোভাবে রোগীর ইতিহাস জানতে হবে। পরিবারের কারোর এই রোগ আছে কি না তা প্রথমেই ভালোভাবে জেনে নেওয়া উচিত। তবে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগীর ইতিহাস জানার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নীরিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। যেসব পরীক্ষার মাধ্যমে রোগটি সনাক্ত করা সম্ভব হয় সেগুলো হলো আইভিইউ, আল্ট্রাসনোগ্রাম, সিটিস্ক্যান, ইত্যাদি।

চিকিৎসা

মেডুলারি স্পঞ্জ কিডনি রোগ ধরা পড়লে নিয়মিতভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নেওয়া উচিত। এ-রোগে আক্রান্ত হলে প্রায়ই রোগীর প্রস্রাবে সংক্রমণ ঘটে। তখন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা নিতে হয়। রোগটি পুষে রাখলে কিডনিতে পাথর হতে পারে। অনেক সময় পাথর ছোট থাকলে আপনা আপনি বের হয়ে যায়, তবে পাথরের আকার যদি বড় হয় তখন অপারেশনের প্রয়োজন হয়। যেসব উপসর্গের কথা আগে বলা হয়েছে সেসব উপসর্গ দেখা দিলে রোগীর অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নেওয়া উচিত। উল্লেখ্য, সঠিক চিকিৎসার অভাবে এ-রোগে আক্রান্ত প্রায় ১০% কিডনি নষ্ট হয়ে যায়।

প্রতিরোধ

মেডুলারি স্পঞ্জ কিডনি প্রতিরোধের সঠিক কোনো উপায় আজ পর্যন্ত জানা যায় নি। তবে কিডনিতে পাথর এবং সংক্রমণ হলে তা প্রতিকারের জন্য ভালো চিকিৎসা আছে। মেডুলারি স্পঞ্জ কিডনির ফলে খুব কম ক্ষেত্রে কিডনি নষ্ট হয়, তথাপি চিকিৎসার কোনো বিকল্প নেই। ■

পরজীবীঘটিত ডায়রিয়া

চৌধুরী মোঃ গালিব, আইসিডিডিআর,বি
তাসনীম আহমেদ, হেলথকেয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিঃ

ডায়রিয়ার সাথে আমাদের দেশের মানুষ অত্যন্ত পরিচিত। তবে আমরা হয়তো অনেকেই জানি না যে ডায়রিয়া সৃষ্টির জন্য দায়ী তিন ধরনের জীবাণু--ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস এবং পরজীবী বা প্যারাসাইট।

এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা, জিয়ারডিয়া এবং ক্রিপটোসপোরিডিয়াম—এই তিন ধরনের পরজীবীই অন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর এবং ডায়রিয়ার জন্য দায়ী। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুরা এসব পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয়, প্রাপ্তবয়স্করাও এর হাত থেকে রেহাই পায় না। প্রাপ্তবয়স্কদের অনেকেই পেট মোচড়ানো বা আঠালো মল হয় এমন অভিযোগ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে এসে থাকেন। এন্টামিবা পরজীবী অনেক ক্ষেত্রে লিভার (যকৃত)-এর অ্যাবসেস বা লিভারে গভীর ক্ষত তৈরি করে, যার ফলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। তাই এসব পরজীবী সম্পর্কে জেনে রাখা ভালো।

বাংলাদেশে এসব পরজীবীর প্রাদুর্ভাব

এন্টামিবা

বাংলাদেশে এসব পরজীবীর প্রাদুর্ভাব নির্ণয়ে যেসব গবেষণা হয়েছে তার বেশিরভাগই হয়েছে আইসিডিডিআর,বি-তে। ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত এক নিবন্ধে দেখা যায়, ঢাকার মিরপুর বস্তি এলাকায় দুই থেকে পাঁচ বছর-বয়সী ৬৮০ জন শিশুর মধ্যে ৫% এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকায় আক্রান্ত ছিলো, যদিও তাদের কারোর মধ্যেই রোগের কোনো লক্ষণ ছিলো না। ২০১৩ সালে প্রকাশিত আরেক গবেষণায় দেখা যায়, আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা হাসপাতালে ১৯৯৩ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত আসা ৫১,৯৯৯ জন রোগীর মধ্যে ১%-এর দেহে এন্টামিবা ছিলো।

জিয়ারডিয়া

আইসিডিডিআর,বি-র অন্য একটি গবেষণায় দেখা যায় ২,৫৩৪ জন ডায়রিয়া রোগীর ৭.৭% জনের মধ্যে জিয়ারডিয়া পাওয়া গেছে। ২০১১ সালে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের একটি যৌথ গবেষণায় ২৬৬ জন শিশুর মধ্যে ৩.৮% জনের দেহে জিয়ারডিয়া পাওয়া যায়।

ক্রিপটোসপোরিডিয়াম

২০০৬-২০০৭ সালে আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা হাসপাতালে ৫৪০ জন রোগীর ওপর

পরিচালিত এক গবেষণায় ৪.৪% জনের মধ্যে ক্রিপটোসপোরিডিয়াম পাওয়া গেছে। এছাড়া দেশের অন্য স্থানে এ-রোগের প্রাদুর্ভাব-সংক্রান্ত তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

লক্ষণ

পরজীবীঘটিত ডায়রিয়ার লক্ষণ সম্পর্কে বলতে গেলে তিনটি পরজীবী আলাদা আলাদা ভাবে বলাই ভালো। যদিও এদের অনেকগুলো লক্ষণেই মিল পাওয়া যায়, তবে এই তিন পরজীবীর লক্ষণ প্রকাশে কিছু সুনির্দিষ্ট ভিন্নতাও রয়েছে।

এন্টামিবা

এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা-র ক্ষেত্রে ধারণা করা হয় যে, পৃথিবীর প্রায় ১০% মানুষ এর দ্বারা আক্রান্ত। তবে এই ১০% মানুষের ৯০% ক্ষতিকারক নয় এমন এন্টামিবা (এন্টামিবা ডিসপার)-এর দ্বারা আক্রান্ত। তবে সমস্যার কথা হলো, ক্ষতিকর এন্টামিবার ৯০% সংক্রমণ বা ইনফেকশনই লক্ষণ প্রকাশ করে না, যাকে বলে অ্যাসিম্পটমেটিক ইনফেকশন। এটি বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় সমস্যা এবং বলা হয় যে প্রতিবছর এ-রোগে প্রায় ৪০ হাজার থেকে এক লক্ষ মানুষ মারা যায়।

এই জীবাণু শরীরে প্রবেশ করার পর এক থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পায়। এদের মধ্যে কারোর খুব সামান্য, কারোর মাঝারি এবং কারোর ভয়াবহ সংক্রমণ দেখা দেয়। লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে কম মাত্রার ডায়রিয়া এবং ডায়রিয়ার সাথে রক্ত ও আঠালো মল। এই অবস্থা মূলত ডিসেন্ট্রি নামে পরিচিত।

এসব ছাড়াও এই পরজীবী যকৃত বা লিভারে বাসা বাঁধতে পারে। যকৃতে বাসা বাঁধলে সাধারণত ডায়রিয়া হয় না তবে শরীরে জ্বর আসে ও পেটে প্রচণ্ড ব্যথা বা মোচড়ানো ভাব থাকে।

জিয়ারডিয়া

জিয়ারডিয়া-র সংক্রমণে ডায়রিয়া হয় পানির মতো। জিয়ারডিয়ায় আক্রান্ত রোগের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ:

- শরীর দুর্বল হওয়া
- খাবারে অরুচি
- পানির মতো মল
- পেট মোচড়ানো

এসব লক্ষণ সংক্রমণের দিন থেকে শুরু করে ৯-১৫ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, অনেক ক্ষেত্রে জিয়ারডিয়ার সংক্রমণের লক্ষণ বোঝা যায় না। জিয়ারডিয়া সাধারণত ক্ষুদ্রান্ত্রে বাসা বেঁধে দেহের পুষ্টিকণা শোষনে বাধার সৃষ্টি করে।

ক্রিপটোসপোরিডিয়াম

এটি মূলত খুবই স্বল্পস্থায়ী ডায়রিয়া। ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে সংক্রমণ সৃষ্টির পর থেকে প্রায় ৭ দিন পর্যন্ত এর লক্ষণ থাকতে পারে। এই ডায়রিয়াতেও এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকার মতো মল আঠালো হয়ে থাকে এবং পেট ব্যথা করে। কোনো কোনো সময় শরীরে হালকা জ্বরও থাকে। এ-রোগে দেহে পানিশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন দেখা দেয়। ক্যান্সার বা এইডস-আক্রান্ত রোগী যাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আগে থেকেই দুর্বল তাদের অনেককে এ-রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

পরজীবী কীভাবে ছড়ায়

এসব পরজীবী মূলত নোংরা পরিবেশ, বাসি খাবার, দূষিত পানি, প্রভৃতির মাধ্যমে ছড়ায়। শিশুদের নোংরা ডায়াপার থেকেও এসব পরজীবী (বিশেষ করে ক্রিপটোসপোরিডিয়াম) ছড়াতে পারে। জিয়ারডিয়া স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিতে তিন মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকে। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এসব রোগের প্রাদুর্ভাব কিছুটা কমেছে, তবে এখনও অনেক মানুষ এ-রোগে আক্রান্ত হয়।

রোগনির্ণয়

সাধারণত ল্যাবরেটরি-তে মল পরীক্ষা করে এসব পরজীবী নির্ণয় করা হয়।

চিকিৎসা

পরজীবীঘটিত ডায়রিয়ার চিকিৎসা বিভিন্ন পরজীবীভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। এসব চিকিৎসা গ্রহণ করার আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। তবে, প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিচে কিছু চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

এন্টামিবা দ্বারা সংঘটিত ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে:

সাধারণত অন্ত্রে বা অন্ত্রের কোষে অথবা যকৃতে এন্টামিবার সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। গ্যাস্ট্রোইনটেসটাইনাল এমিবিয়োসিসের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাধারণত মেট্রোনিডাজল বা টিনিডাজল গ্রুপের ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেটি রক্তের মধ্যে বিদ্যমান এন্টামিবাকে ধ্বংস করতে সক্ষম। পাশাপাশি অন্ত্রের গাত্রে এবং যকৃতের মধ্যে বিদ্যমান এন্টামিবাকেও ধ্বংস করতে পারে এই ওষুধটি। সাধারনত ১০ দিন পর্যন্ত মেট্রোনিডাজল ব্যবহার করতে হয়। পুরো অন্ত্রের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাধারণত লুমিনাল ওষুধ ব্যবহার করা হয়, যেটি পুরো অন্ত্রজুড়ে এমিবাকে ধ্বংস করে। লুমিনাল ওষুধ তিনটি ওষুধের সমন্বয়ে হয়ে থাকে—আয়োডোকুইনল, প্যারোমাইসিন এবং ডিলোক্সানাইড ফিউরয়েট। যাদের নিয়মিত পায়খানার সাথে এমিবা যায় কিন্তু এমিবায়োসিসের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না তাদের ক্ষেত্রেও লুমিনাল ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

জিয়ারডিয়া দ্বারা সংঘটিত ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে:

জিয়ারডিয়া চিহ্নিত হলে সাধারণত তিনটি অতিপরিচিত ওষুধ দিয়ে রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে, সেগুলো হলো—মেট্রোনিডাজল, টিনিডাজল এবং ফিউরাজোলিডন।

ক্রিপটোসপোরিডিয়াম দ্বারা সংঘটিত ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে:

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিকিৎসা ছাড়া ক্রিপটোস-পোরিডিয়াম-এর দ্বারা সংঘটিত ডায়রিয়া ভালো হয়ে যায়। ডায়রিয়া থেকে সহজেই সুস্থ হওয়া যায় যদি ডায়রিয়া হওয়ার সাথে সাথে সঠিকভাবে স্যালাইন গ্রহণ করা হয়। তবে যেকোনো পরজীবী দ্বারা সংঘটিত ডায়রিয়াই হোক না কেন তা যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তাহলে অবশ্যই রেজিস্টার্ড/বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা নিতে হবে।

প্রতিরোধ

শরীরের নিজস্ব রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্যাস্ট্রোইনটেসটাইনাল এমিবায়োসিস প্রতিরোধ করতে পারে না। সেজন্যে আমাদের কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, যেমন বিশুদ্ধ পানি পান করা, বাসি খাবার পরিহার করা, ফলমূল খাওয়ার আগে ভালো করে ধুয়ে খাওয়া এবং খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া। এসব পরজীবী প্রতিরোধ করার জন্য এখন পর্যন্ত কোনো টিকা আবিষ্কৃত হয় নি।

নিজে সচতেন থেকে অপরকে সচেতন করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিলে সহজেই এসব পরজীবী থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। এ-ব্যাপারে দেশবাসীকে সচেতন করে তোলার জন্য সরকারের উচিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সেই সাথে দেশব্যাপী এসব পরজীবীর প্রাদুর্ভাবের হার নির্ণয় করা খুবই জরুরী, যা ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে সাহায্য করবে। ■

স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা আহ্বান
যেকেউ স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা দিতে পারেন। স্বাস্থ্যসম্পর্কিত যেকোনো মানসম্মত লেখা আমরা স্বাস্থ্য সংলাপে ছাপাতে পারি। লেখা সম্পর্কে ধারণা নিতে http://www.icddrb.org/shasthyasanglap লিংকটিতে স্বাস্থ্য সংলাপের পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো দেখুন। লেখা পাঠাবার ঠিকানা: hasib@icddrb.org।